ভূমিকা

বাংলা তথা সমগ্র ভারতীয় কথাসাহিত্যে আশাপূর্ণাদেবী একটি বিশিষ্ট নাম। ১৯০৯খ্রীঃ থেকে ১৯৯৫খ্রীঃ — প্রায় সমস্ত বিংশ শতাব্দী জুড়ে বিস্তৃত তাঁর জীবন। আর ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম কবিতা প্রকাশ "বাইরের ডাক" থেকে ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর তিন মাস আগে পর্যন্ত — দীর্ঘ ৭৩ বছর ধরে ব্যাপৃত তাঁর সাহিত্য জীবন। "সু-শিক্ষিত মানুষমাত্রই স্ব-শিক্ষিত" — প্রমথ চৌধুরীর এই বক্তব্যটি যেন অক্ষরে অক্ষরে মিলে যায় আশাপূর্ণাদেবীর ক্ষেত্রে। বিরূপ সমাজ তাঁকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভের সুযোগ না দিলেও তিনি হয়ে উঠেছেন বিদগ্ধ মানুষজনের আলোচনার বিষয়। ইচ্ছা, নিষ্ঠা এবং শ্রম কিভাবে একজন মানুষকে গড়ে তুলতে পারে, কিভাবে নিজেই নিজের পরিচয় নির্মাণ করতে পারে, তারই মূর্তিমান উদাহরণ আশাপূর্ণাদেবী। নিজের চেষ্টায় লেখাপড়া শেখা, আর সেই প্রত্যয়েই লেখনী ধারণ। তবু নিজের পরিচয় দেন এইভাবে— "আমি যত না লেখিকা তার চেয়ে বড় পাঠিকা"। শুরু করেছিলেন শিশুসাহিত্য দিয়ে। 'কল্লোল'-এর কল্লোলিত কালেও তিনি শিশু সাহিত্য রচনায় মগ্ন ছিলেন, ছিলেন লোকচক্ষুর আড়ালে। অনেকদিন পর তিনি বড়দের রচনায় হাত দেন, আর তারও অনেক পরে জনসমক্ষে উপস্থিত হন। বলা বাহুল্য, তাঁর লেখনীর ধার-ভার তাঁকে বেশীদিন অন্তরালে থাকতে দেয় নি, বের করে এনেছে জনসমক্ষে। আর এরপর তো শুধুই জয়মাল্য লাভের পালা।

আশাপূর্ণাদেবী তাঁর দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখা মানুষগুলিকে রূপ দিয়েছেন তাঁর রচনায়। সাহিত্যের উপজীব্য কি? — এ বিষয়ে তাঁর মত ছিল "সাহিত্যের উপজীব্য — 'মানুষ'। জলজ্যান্ত রক্তমাংসের মানুষ। যে মানুষকে চোখে দেখা যায়, হাতে ছোঁওয়া যায়। যার কথা কানে শুনি, যার আবেগ ইচ্ছা বাসনা বেদনাকে অনুভব করি। সাহিত্যের উপজীব্য সেই মানুষ যে মানুষকে তার বিরুদ্ধ পরিবেশ অহরহ ভাঙছে গুঁড়োচ্ছে মোচড়াচ্ছে দোমড়াচ্ছে, আর অবশেষে একটা বিকৃত চেহারায় টেনে আনছে, যে মানুষকে তার সব অপরিতৃপ্ত বাসনা, সমস্ত অপূর্ণ ইচ্ছা, প্রতিপদে দীর্ণ বিদীর্ণ খন্ড খন্ড করছে, আর যে মানুষের এই খন্ড দীর্ণ রক্তমাংসের অতীতে অবস্থিত এক অমৃত-পিপাসু আত্মা অনুক্ষণ জর্জরিত বেদনায় আর্তনাদ করছে।" (পৃষ্ঠা-১৩৫/নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন, কটকঃ

২৬ শে ডিসেম্বর ১৯৬৪, বাংলা সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর ভাষণ/আশাপূর্ণাদেবী/ আর এক আশাপূর্ণা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৪) আর সাহিত্যিক হলেন চলমান জীবনের কারবারী। তিনি চিরকাল একই কেন্দ্রবিন্দুতে স্থির থাকতে পারেন না। "যুগ বদলায়, কাল বদলায়, সমাজ মানসিকতার বদল হয়। সাহিত্যিকের মধ্যেও জীবন জিজ্ঞাসার পরিবর্তন ঘটে। ওই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতেই পরিবর্তন ঘটে তার ভাষায়, আঙ্গিকের, প্রয়োগ কৌশলের। পরিবর্তন ঘটে না শুধু তার সাহিত্য-ধর্মের, তার সত্যবোধের।" (পৃষ্ঠা-১৯/আমার সাহিত্য চিন্তা—আশাপূর্ণাদেবী/ আর এক আশাপূর্ণা/ঐ) সাহিত্যের অবিনশ্বরতা, সাহিত্যিকের দায়িত্ব—এসব সম্পর্কেও তিনি ছিলেন সচেতন, আর শেষ পর্যন্ত তিনি ছিলেন আশাবাদী। মানুষ যে খাঁটি উপাদানে তৈরী তা তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি ছিল তাঁর অসীম বিশ্বাস।

ইংরেজি সাহিত্যের লেখিকা জেন অস্টেনের মতই আশাপূর্ণাদেবী মূলত মধ্যবিত্ত সমাজকেই তাঁর লেখার হাতিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছিলেন। আর সেইসঙ্গে মধ্যবিত্তের চির-চেনা অন্তঃপুরকে নতুন করে চিনিয়েছিলেন। সেখানে কত বিচিত্র মানুষজন, তাদের বিচিত্র সম্পর্ক, সেই সম্পর্কের বহুকৌণিক রহস্য। অধ্যাপক নিতাই বসু মন্তব্য করেছেন "উপন্যাসে ও ছোটগল্পে আশাপূর্ণা চিরকাল চেনা মানুষদের যেন নতুন করে খুঁজতে চেয়েছেন, বুঝতে চেয়েছেন তাদের হৃদয়-রহস্য। এজন্য তাঁকে কখনও চার দেওয়ালের বাইরে পা বাড়াতে হয়নি, তিনি আজীবন চার দেওয়ালের চিত্রকর হয়েই বাংলা সাহিত্যের পাঠকের রসাস্বাদ মিটিয়েছেন।" (পৃষ্ঠা-২৫ /আশাপূর্ণাদেবীর উপলব্ধির জগৎ - নিতাই বসু / কোরক সাহিত্য পত্রিকা, আশাপূর্ণাদেবী সংখ্যা, জানুয়ারী-এপ্রিল ২০০৯) আশাপূর্ণাদেবীও বার বার বলেছেন তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার বাইরে পা ফেলেন নি কখনও। আর তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল অন্তঃপুরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা এবং ততোধিক রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত পরিবারের বধূ আশাপূর্ণার মাত্র বারো বছর বয়সেই বাড়ির বাইরে বেরোনোর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে যায়। তাই বাইরেটাকে মূলত জানালা থেকে, পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়েই জানা। যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনের এক উত্তাল সময়ে তাঁর বেড়ে ওঠা। আশাপূর্ণা তাঁর প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, আর নিপুণ পর্যবেক্ষণের মধ্য দিয়ে দেখেছেন অন্দরের মা-মাসিমা-মামীমা-পিসিমা-ঠাকুমা-দিদিমা-র জগৎকে, তাঁদের রাজ্যপাঠকে, তাঁদের নারী-পুরুষের প্রতি

বৈষম্যমূলক আচরণকে, আর অল্পবয়সীদের, বিশেষত বৌ-দের অসচেতনতা, অসহায়তাকে। আর এইসবই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে অন্তঃপুরের ইতিকথা রচনায়।

আশাপূর্ণাদেবী বলেছেন, "যা লিখেছি সবই মধ্যবিত্ত জীবনের গন্ডি থেকে দেখা। .....আমি রাজনীতি নিয়ে লিখিনি, সমাজসেবিকাদের নিয়েও তেমন নয়। লিখেছি ঘরোয়া মেয়েদের নিয়ে। লিখেছি তাদের যখন অসহনীয় অবস্থা হয়, তখন তারা ঘর ছাড়ে অথবা বর ছাড়ে। চিরদিনই ভেতরে একটা আপসহীন বিদ্রোহ ছিল, কিন্তু সেটা প্রত্যক্ষ নয়। তাকে যদি নারীমুক্তির পিপাসা বল তাহলে তাই। সেটা ব্যক্তিগত নয়। সমষ্টিগত, সমাজের জন্য! আমাদের সময়ে বিদ্রোহিণী কথাটাই ছিল, নারীমুক্তি শব্দটি ছিল না।" (পৃষ্ঠা-১৯৮ / যা-হয় তাই আমি লিখি— সাক্ষাৎকার- চিত্রা দেব / 'দেশ' পত্রিকা ২.২.১৯৯১, উৎসঃ কোরক সাহিত্য পত্রিকা/ঐ) অন্তঃপুরের সেকাল এবং একালের নারীদের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরীর চেষ্টা, ঘরে-বাইরে দু-দিকেই মেয়েদের যুদ্ধময় জীবনের কথা তিনি তুলে ধরেছেন। এর পিছনে তাঁর প্রতিবাদী মন যেমন কাজ করেছে, সেইসঙ্গে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত লেখার টেকনিক উপন্যাস এবং ছোটগল্পের যথার্থ প্লাটফর্মটিকে বজায় রেখে মানুষের চরিত্রের রহস্যভেদের উপায়টিকে মনস্তাত্ত্বিক জিজ্ঞাসায় ছুঁড়ে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তাঁর লেখা প্রধানত মনস্তত্ত্বমূলকই, ঘটনাবহুল তেমন নয়। "আমি মেয়েদের জীবনের মানসিক সংগ্রামের কথাই বলেছি। বহির্জীবনের জটিলতার জট খুলতে চেষ্টা করি নি।" (যা হয় তাই আমি লিখি/ঐ)

দীর্ঘকাল ধরে লিখেছেন আশাপূর্ণাদেবী। কিন্তু কখনো তাঁর লেখার মানের অবনমন ঘটে নি। রাজশেখর বসু এক চিঠিতে আশাপূর্ণাদেবীকে লেখেন "আমি গোগ্রাসে পড়তে পারি না, কোনও লেখকের রচনার সঙ্গে আমার বেশী পরিচয় নেই। যেটুকু আছে তাতে আমার যে ধারণা হয়েছে তা জানাচ্ছি। যাঁরা জনপ্রিয় খ্যাতনামা লেখক এবং অজস্র লেখেন, তাঁদের যদি ইস্কুলের ছাত্রের মতন নম্বর দেওয়া যায় তবে অধিকাংশের বেলায় পরীক্ষার ফল এইরকম দাঁড়ায় — চার আনা রচনা ৭৫ এর ওপর নম্বর পায়, ছ আনা ৫০-এর কাছাকাছি পায়, বাকি ছ আনা ২৫ বা তারও কম পায়। অর্থাৎ এঁদের রচনায় গুণের পার্থক্য খুব বেশী দেখা যায়। বোধ হয় পাঠক আর প্রকাশকের আবদার ঠেলতে না পেরে এঁরা অনেক সময় অনিচ্ছায় লেখেন।

আপনার (এবং আরও দু-একজন লেখকের) বেলায় ব্যতিক্রম দেখছি। আপনিও বোধ হয় বিস্তর লেখেন, কিন্তু আপনার কোনও গল্পই ৫০-এর কম নম্বর পায় না, অনেক গল্প ৭৫-এর বেশী পায়। সাহিত্যের বিচার অঙ্ক ফেলে হয় না, কিন্তু আমার বক্তব্য প্রকাশের জন্য উপায় পাচ্ছি না।

আপনার অবলম্বন — 'সাধারণ বাঙালীর জীবন', গভীর সমবেদনা, আর সরল ভাষা। এতেই আপনি অসাধারণ কৃতিত্ব দেখিয়ে খ্যাত হয়েছেন।" (আশাপূর্ণাদেবীকে লেখা রাজশেখর বসুর একটি চিঠি — ২০/২/৫৩, উৎসঃ কোরক সাহিত্য পত্রিকা/ঐ)

রাজশেখর বসুর এই মন্তব্য আশাপূর্ণাদেবীর প্রতিভারই স্বীকৃতি দেয়। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ও বলেছেন "ওঁর কোনও লেখাই পড়ে কখনও মনে হয় নি, এ লেখাটা না পড়লেও চলত"। বুদ্ধদেব গুহও একই কথা বলেছেন — "গত চল্লিশ বছরে তাঁর যত লেখা পড়েছি — তার মধ্যে একটিকেও খারাপ বলতে পারি না। পৃথিবীর যে কোনও লেখক-লেখিকার পক্ষেই এই মানের উচ্চতায় বা সমতায় পৌঁছনো প্রায় অস ব ব্যাপার।" মহাশ্বেতা দেবী বলেছেন "বাংলা-সাহিত্যে তাঁর স্থান সম্রাজ্ঞীর মতো"। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন "শুধু বাংলা ভাষায় নয়, তিনি সারা ভারতের একজন প্রধান লেখিকা"। প্রফুল্ল রায় বলেছেন "ক্ষমতা থাকলে আশাপূর্ণাদেবীকে নোবেল প্রাইজ দিতাম"। আর আশাপূর্ণাদেবীর ট্রিলজির জন্য নবনীতা দেবসেন বলেছেন "অসামান্য ব্যক্তি"। তাঁর মতে "বিশ্বসাহিত্যে আর কোনও মহিলা সাহিত্যিক তো নেই-ই — হাতে গোনা মাত্র কয়েকজন পুরুষ ঔপন্যাসিক আছেন যাঁরা এতখানি এলেম রাখেন"। তবু এই আশাপূর্ণাদেবী সম্পর্কেই মন্তব্য করা হয়েছিল তিনি "রান্নাঘরের লেখিকা"। পাঠক মহলেও কি তাঁর উপযুক্ত মর্যাদা তিনি পেয়েছেন! আজও মহিলা পাঠকসমাজই বিশেষ করে তাঁর রচনার ভক্ত থেকে গেছে।

বাংলাদেশের প্রয়াত, প্রবল নারীবাদের প্রবক্তা হুমায়ুন আজাদ যে কথা বলেছেন, তার বক্তব্যটা এই — নারী লেখক, বা তার লেখা মূল্যবান নয় পুরুষের কাছে; তাই বাঙালি নারি-সাহিত্যের কোনো ইতিহাস আজো লেখা হয় নি; তাঁদের প্রতিভার প্রকৃত বিচার বা মূল্যায়ন হয় নি; এমনকি তাদের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যও বেশ দুষ্পাপ্য। (পৃষ্ঠা-৩৩৪/নারী-হুমায়ুন আজাদ/আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ১৯৯২) আশাপূর্ণাদেবীও এই অনীহা সম্পর্কে উষ্মা

প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছেন "আমরা মেয়েরা আজ পুরুষের সঙ্গে আইনগত সমান অধিকার লাভ করে যতোই কেন না পুলকিত হই, আজও আমাদের সমাজ রীতিমত পুরুষ শাসিত। আজও দেশের সমগ্র কর্ম্মকেন্দ্রের আর ক্ষমতাকেন্দ্রের কলকাঠিগুলি পুরুষেরই হাতের মুঠোয়। আজও পুরুষের চোখে মেয়েরা তাচ্ছিল্যের আর অবহেলার পাত্রী। যুগ যুগ সঞ্চিত এই সংস্কার আজও মিশে আছে পুরুষের রক্তে মাংসে অস্থিতে মজ্জায়। মেয়েদের কর্ম্মতপস্যার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টি ভিন্ন সত্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখার অভ্যাস তাঁরা আজও অর্জ্জন করেন নি। তাই মেয়েদের স্বীকৃতি দিতে আজও তাদের লজ্জায় বাধে।

তাই ঐতিহাসিক সাহিত্য সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে যখন সাহিত্যের অনেক শূরবীররা "বাংলা সাহিত্যের দু'শো বছরের ক্রমবিকাশের" আলোচনা করেন, সে আলোচনায় রামমোহন রায় থেকে শুরু করে বর্ত্তমান কালের কনিষ্ঠতম লেখকটির পর্যন্ত নাম উল্লিখিত হয়, উচ্চারিত হয় না একটিও মহিলা সাহিত্যিকের নাম।

অন্ততঃ পথিকৃত হিসাবেও যে স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী, মানকুমারী দেবী, কামিনী রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা উচিত, এই সহজ তথ্যটুকুও স্মরণে আসে না সেই শূরবীর পন্ডিতবর্গের।" (পৃষ্ঠা-২০৫ /অনুরূপা দেবী/নিজের আয়নায় — আর এক আশাপূর্ণা/ ঐ)

বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে যেসময় আশাপূর্ণাদেবীর অনুপ্রবেশ ঘটে, সেসময় সাহিত্যের প্রাঙ্গনে নারী তার শারীরিক উপস্থিতিকে কায়েম করে নিয়েছে এবং এমন অনেকেই আছেন, যাঁরা এই অঙ্গনে পা রেখেছিলেন বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই। এ-প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী দেবী, নিরুপমা দেবী, অনুরূপা দেবী, শৈলবালা ঘোষজায়া, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, গিরিবালা দেবী, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, বাণী রায়, আশালতা সিংহ, জ্যোতির্ময়ী দেবী — প্রমুখের নাম করা যায়। এঁদের রচনার একান্ত ভক্তও ছিলেন আশাপূর্ণাদেবী। এঁদের রচনা পড়েই তাঁর বড় হয়ে ওঠা। তাই হয়ত কোনো কোনো ক্ষেত্রে এঁদের কারো কারো রচনার বিষয় বা বক্তব্য তাঁকে অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত করতে পারে। যদিও তিনি বলেছেন "প্রভাব পড়েছে কি না, সে বিচার পাঠকের। তবে আমার যা কিছু জানা সবই তো বই পড়ে। যাঁদের বই পড়েছি সেখান থেকে কিছু নিয়েছিও হয়তো। তবে স্বেচ্ছায় কাউকে অনুকরণ করেছি বলে মনে হয় না।"

(যা-হয় তাই আমি লিখি — সাক্ষাৎকার চিত্রা দেব / 'দেশ' পত্রিকা ২.২.১৯৯১/উৎসঃ কোরক সাহিত্য পত্রিকা/ঐ)

সে যাই হোক, অধ্যাপক অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত অনুযায়ী, এইসব "বাঙালি মহিলা ঔপন্যাসিক ও কথাকারের রচনায় পারিবারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, স্বামী-সন্তানহারা বৈধব্যজীবনের নিঃসঙ্গতা, কখনো ঝরে পড়া শিউলি ফুলের মতো নীরব নিভৃত প্রেম-প্রণয় চকিতের মতো ফুটে ওঠে। স্বাভাবিক কারণে সেকালের মহিলা ঔপন্যাসিকেরা দাম্পত্য প্রণয় ছাড়া প্রেমের আর কোনো শাখা-প্রশাখায় রক্তচক্ষু আফিমের ফুল ফোটাতে সাহস করতেন না — স বতঃ গৃহবধূর সঙ্কোচ ও পারিবারিক নিষেধের কারণে। অবশ্য কেউ কেউ ইতিহাসের রাজবর্ত্মও স্বীকার করেছিলেন। .....ততটা সফল হন নি। পারিবারিক ও গার্হস্থ্য জীবনচিত্রই তাঁদের অধিকতর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।" (পৃষ্ঠা-XIV/প্রতিভাময়ী আশাপূর্ণা-অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়/আশাপূর্ণাদেবী রচনাবলী-প্রথম খন্ড/খণ্ড/মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পঞ্চম মুদ্রণ, ২০০৮) আর সেখানে আশাপূর্ণাদেবীর লেখনী "শুরু হয়েছে ব্যক্তি, পরিবার ও গার্হস্থ্য জীবনকে কেন্দ্র করে, কিন্তু পল্বলের মতো সেখানেই স্থিতিলাভ করে নি, বরং কূলভাঙা গতিতে ঘটনাপ্রবাহের দূই পার প্লাবিত করে বাঙালির বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় বিস্তার লাভ করেছে।" (পৃষ্ঠা-XV/ঐ)

তাছাড়া তাঁর রচনায় আছে আশ্চর্যরকম কথকতাধর্মিতা। তিনি গল্প লেখেন না, বলেন। এই গল্প বলার অনায়াস দক্ষতা তাঁর রচনায় সৃষ্টি করে অসাধারণ স্বাদুতা। সামান্য ঘরোয়া কথা, পারিবারিক বৃত্তান্ত, সাংসারিক খুঁটিনাটি, দৈনন্দিন জীবনের তুচ্ছ ঘটনারাশি তাঁর কলমের জাদুতে, তাঁর হৃদয়ের ছোঁয়ায় অসামান্য হয়ে উঠেছে। অধ্যাপক হীরেন চট্টোপাধ্যায়ও মন্তব্য করেছেন — "ছোটবেলা থেকে পড়ে আসছি তাঁর লেখা — সেই আটপৌরে ভঙ্গি, দারুণ কিছু একটা লিখছি এইরকম খটমটে আস্ ালন দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের কোনো চেষ্টা নেই, বিষয়েও যে বিরাট বৈচিত্র্য বা গবেষণাধর্মী কোনো ক্রিয়াকর্ম, এরকমও নয়, অথচ এই দীর্ঘ দিন পড়তে থাকা গল্প-উপন্যাস শুধু ভালোই লেগেছে।" (পৃষ্ঠা-১০ / আশাপূর্ণাদেবী-হীরেন চট্টোপাধ্যায় / কোরক সাহিত্য পত্রিকা-আশাপূর্ণাদেবী সংখ্যা / ২০০৯) পূর্ববর্তিনীদের কথা বলতে গিয়ে আশাপূর্ণাদেবী নিজেও বলেছেন — "আগে যাঁরা লিখতেন তাঁরা মোটামুটি সবাই আদর্শপ্রধান লেখা লিখতেন অর্থাৎ সেখানে বলা হত এরকম 'হওয়া

উচিত'। আমি বরাবরই লিখি 'এরকম হয়'। এইরকম হওয়া উচিত একথা বলি না।" (পৃষ্ঠা-১৯২/যা-হয় তাই আমি লিখি/ঐ) এক্ষেত্রে তিনি নিজেকে শৈলবালা ঘোষজায়ার স্ব-গোত্র বলেছেন। আশাপূর্ণাদেবীর লেখনীর আর যে গুণটি পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে তা হল তাঁর যুক্তিবাদিতা। তরল ভাবালুতাকে অনেকক্ষেত্রেই তিনি বর্জন করেছেন এবং অনেক নির্মম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন চরিত্রের গতি রূপায়ণে। আর "চিরাভ্যস্ত গার্হস্থের কৃষ্ণ মহাদেশের মেয়ে হয়ে, বউ হয়ে, মা হয়ে যারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হয়ে ওঠার আনন্দ-যন্ত্রণা-প্রত্যাহ্বান তেমনভাবে অনুভব করতে পারল না — খানিকটা কল্পনা, খানিকটা আকাঙ্ক্ষা, খানিকটা ইচ্ছাপূরণ দিয়ে মূলত তাদেরই পুনর্গঠন করে গেছেন আশাপূর্ণা। .....অসমাপ্ত আধুনিকতার খন্ডিত আবহে কেমন করে ধীরলয়ে বিনির্মিত হচ্ছিল বাঙালির অন্তঃপুর, তা বোঝার জন্যেই আশাপূর্ণার উপন্যাস-বিশ্বের পুনঃপাঠ প্রয়োজন।" (আশাপূর্ণা ঃ পুনর্বিবেচনার প্রস্তাবনা/তপোধীর ভট্টাচার্য/কোরক সাহিত্য পত্রিকা, আশাপূর্ণাদেবী সংখ্যা ২০০৯)

দুই বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাতে যখন বাইরের পৃথিবী বিধ্বস্ত, মানুষের পুরাতন মূল্যবোধগুলি যখন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, ভেঙে যাচ্ছে যৌথ পরিবারের ধারণা, মানুষে মানুষে সম্পর্কের এক নতুন মাত্রা বিন্যস্ত হচ্ছে, তখনো পর্যন্ত চার দেওয়ালের মধ্যেকার জীবনটাই মেয়েদের পৃথিবী। আর এই পৃথিবী পরিক্রমার কাজটিই নিপুণভাবে করলেন আশাপূর্ণাদেবী দক্ষ পর্যটকের মত অসামান্য সংবেদনশীল মন ও সুগভীর পর্যবেক্ষণ শক্তিতে ভর করে, সেই অভিজ্ঞতা প্রকাশ করলেন তাঁর রচনায়। অন্তঃপুরের সেই মর্মকথা অধিকার করে নিল পাঠকের হৃদয়। মেয়েলি নজরে, মেয়েলি বিশ্লেষণে, মেয়েলি মননে মেয়েমহলের অন্তর্ভেদ ঘটালেন। পূর্ববর্তিনীদের রচনায় ছিল মেয়েজীবনের দহন, বেদনা, পরাজয় ও সমবেদনার অশ্রু। কিন্তু ছিল না মেয়েজীবনে লগ্ন থেকেও এক বিস্ময়কর নিরাসক্তি, অপরিসীম মমত্বের সঙ্গে দুর্লভ নৈর্ব্যক্তিকতা — এসব মিলল আশাপূর্ণাদেবীতে। মেয়েজগতে বাস করেও তিনি খুঁজে ফিরেছেন প্রতিটি অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠ, তাতে ফেলেছেন জীবনের সহজ সত্যের আলো। তাতে উচ্চকিত আলোর ধাঁধা নেই, আছে জীবনের প্রতি অবিচল আস্থা, আর আত্মানুসন্ধানের প্রেরণা। এভাবেই, মেয়ে জগতের লেখক বলেই, নিজের জোরের জায়গাটি তৈরী করে নিলেন আশাপূর্ণাদেবী। 'মেয়েদের লেখা', 'মেয়েদের জন্য লেখা' বলে পিতৃতন্ত্র

যাকে উপেক্ষা করেছে, তা-ই তাঁর অতুলনীয় গৌরবের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তিনি হলেন মানব-ইতিহাসের অন্যতম ধারার প্রবক্তা।

আশাপূর্ণাদেবী তাঁর এক বিখ্যাত উপন্যাসের ভূমিকায় জানিয়েছেন — "বহির্বিশ্বের ভাঙাগড়ার কাহিনী নিয়ে রচিত হয় বিগত কালের ইতিহাস। আলো আর অন্ধকারের পৃষ্ঠপটে উচ্চকিত সেই ধ্বনিমুখর ইতিহাস পরবর্তীকালের জন্য সঞ্চিত রাখে প্রেরণা, উন্মাদনা, রোমাঞ্চ। কিন্তু স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ? যেখান থেকে রঙ বদল হয় সমাজের, যুগের, সমাজ মানুষের মানসিকতার। ..... তবু রচিত ইতিহাসগুলি চিরদিনই এই অন্তঃপুরের ভাঙাগড়ার প্রতি উদাসীন। অন্তঃপুর চিরদিনই অবহেলিত।" (প্রথম প্রতিশ্রুতি-আশাপূর্ণাদেবী) আশাপূর্ণাদেবী আমাদের পরিচিত মধ্যবিত্ত জীবনের এই অবহেলিত অন্তঃপুরেরই রূপকার। সমাজবিজ্ঞানীর নিপুণতায় সেই অন্তঃপুরের সত্যকে তিনি চিত্রিত করেছেন। কিন্তু এই অন্তঃপুর-ও তো চিরকাল একজায়গায় স্থির হয়ে নেই, তারও ঘটেছে বদল, সেখানেও ধ্বনিত হয়েছে প্রতিবাদ। চাপা পড়ে যাওয়া বোবা কান্না পরিণত হয়েছে ফোঁসফোঁসানীতে। আমরা আশাপূর্ণাদেবীর কিছু উপন্যাসের সূত্রে সেই অন্তঃপুরের বিবর্তনের ইতিহাসকে ধরতে চেষ্টা করেছি। সময় প্রবহমান, কাজেই পরিবর্তনশীল। সময়ের এই পরিবর্তন প্রকটিত হয় সমাজদেহের পরিবর্তনে। সমাজদেহের পরিবর্তনে পরিবর্তন ঘটে সামাজিক জীবগুলির মানসিকতারও। কিন্তু সেই পরিবর্তনের সূচনা ঘটে কি অন্দরমহলে? নাকি সময়-সমাজ পরিবর্তন ঘটায় অন্দরহলে, যেখানে সিংহভাগ জুড়ে শুধুই মেয়েরা! আশাপূর্ণাদেবী তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে সময় ও সমাজের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্দরমহলের তথা নারীর বিবর্তিত রূপটিও ধরতে চেয়েছেন। আমাদের ঔৎসুক্য সেখানেই। আমাদের গবেষণার বিষয় "আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসে সময়, সমাজ ও নারী"।

আমরা বিষয়টিকে পরিস্ফুট করতে কয়েকটি অধ্যায়ে ভাগ করেছি — প্রথম অধ্যায়- "আশাপূর্ণাদেবীর ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য জীবন", দ্বিতীয় অধ্যায় - "আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসে সময়", তৃতীয় অধ্যায় - "আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসে সমাজ" এবং চতুর্থ অধ্যায় - "আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসে নারী"। শেষে একটি উপসংহার সংযুক্ত করেছি। দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতেই পাত্র-পাত্রী, কুশীলব পাল্টায়। সময় ও সমাজ তৈরি করে মানুষের

মানসিকতা; সেই সঙ্গে একটি সময়ের গড়ে ওঠা নিয়মের কাঠামোকে গ্রহণ-বর্জনের মধ্য দিয়ে নতুন মানসিকতা ও নিয়ম গড়ে তোলার পথও তৈরি করে যায়। এমনি করেই কালিক ভাবনার বিবর্তন ঘটতে থাকে। বাংলা তথা ভারতীয় পরিবারতন্ত্রে নারী যেভাবে পুরুষ শাসনের শিকার হয়েছে এবং অনেক যুগ পেরিয়ে এক বিশেষ প্রেক্ষাপটে আবার নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চাইছে বা প্রমাণের পথে এগিয়ে চলেছে তারই নিপুণ আলেখ্য আশাপূর্ণাদেবীর উপন্যাসে মেলে। সে কারণেই উপন্যাসের বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে সময় সমাজ ও নারীর পরিচয় তুলে ধরার চেষ্টা রেখেছি।